কমিউনিস্ট আন্দোলন পুনর্গঠন আবশ্যক কিন্তু কেন?

আফ্রিকার গুটি কয়েক দেশ ব্যতিরেকে দুনিয়ার সর্বত্রই কমিউনিস্ট পার্টি দাবীদার অনেকগুলো পার্টি আছে। কোনো কোনো দেশে ডজন ডজন কমিউনিস্ট দলও আছে। সোভিয়েত ইউনিয়ন ১৯৭৭ সালের সংবিধানে দাবী করেছিল তারা নাকি কমিউনিজমের সীমায় উপনীত হয়েছিল। চীন, ভিয়েতনাম, ডি পি আর কে, কিউবা ইত্যাদি দেশগুলোতো নিজেদেরকে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র বলে দাবী করে আসছে। সংবিধানমূলে স্বৈরতন্ত্রী বলিভারের রিপাবলিক হলেও লেনিনীয় সমাজতন্ত্রের বিষয়টি ভেনিজুয়েলার সংবিধানে বিবৃত না হলেও সেটিকেও ওরা সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র বলে বেড়াচ্ছে। যুক্তরাজ্যের লেবর পার্টি, পাকিস্তানের ভুট্টোর পিপলস পার্টি এমনকি ভারতের পশ্চিমবংগের, মুখ্য মন্ত্রী মমতা ব্যানার্জির দলের বিবৃতি মতো তৃণমূলও সমাজতন্ত্রের দল। নকশালীরা সহ নানান দেশে মাওপন্থীদের নানান ভগ্নাংশ নির্বাচন ও গেরিলা যুদ্ধে লিপ্ত আছে কমিউনিজমের কথা বলে। লেনিনের দৃষ্টিতে যারা শিশুসুলভ বামপন্থী তাদেরও অনেকগুলো গ্রুপ কমিউনিজম প্রতিষ্ঠার আন্দোলন করছে বলে দাবী করে আসছে। আরো ভিন্ন ধারার কতিপয় সংগঠনও নানান প্রস্তাব ও প্রজেক্ট নিয়ে কমিউনিজম প্রতিষ্ঠায় স্বক্রিয় বলে দাবীদার। কিন্তু, আদৌ তারা কমিউনিস্ট আন্দোলন করছে না কি কমিউনিস্ট আন্দোলনকে গোপন, আড়াল ও বিরোধীতা করছে এবং কমিউনিজম বিষয়ে নানান ভ্রান্তি ও বিভ্রান্তি ছড়িয়ে দুনিয়ার মজুরদেরকে ভাগ-বিভাগও করে যাচ্ছে? পেছনে তাকানো যাক।

কমিউনিজম ও কমিউনিস্ট আন্দোলন বিষয়ে কমিউনিস্ট পার্টির ইস্তেহারের চ্যাপ্টার -২। "প্রলেতারিয়েত ও কমিউনিস্ট" অংশের শেষ দুই প্যারায় বলা হয়েছে : "বিকাশের গতিপথে যখন শ্রেণী পার্থক্য অদৃশ্যায়িত, এবং সকল উৎপাদন গোটা জাতির এক বিশাল সমিতির হাতে কেন্দ্রীভূত হচ্ছে, তখন সার্বজনিক ক্ষমতা তার রাজনৈতিক চরিত্র হারাবে। যথার্থভাবে বলা হলে, রাজনৈতিক ক্ষমতা হচ্ছে অন্য শ্রেণীকে নিপীড়নের জন্য এক শ্রেণীর নিছক সংগঠিত ক্ষমতা। বুর্জোয়াদের সাথে প্রতিযোগিতার কালে, যদি প্রলেতারিয়েত পারিপার্শ্বিক অবস্থার চাপে বাধ্য হয়ে, নিজেকে একটি শ্রেণী হিসাবে সংগঠিত করে; যদি একটি বিপ্লবের মাধ্যমে, ইহার নিজেকে শাসক শ্রেণীতে পরিণত করে, এবং সেরকম অবস্থায় উৎপাদনের পুরনো অবস্থাকে বলপূর্বক দূরীভূত করে, তখন এই অবস্থার সাথে, শ্রেণী বৈরীতা ও সাধারণত শ্রেণীগুলির বিদ্যমানতার অবস্থাগুলি ইহা দূর করবে, এবং সাধারণভাবে শ্রেণীগুলি এবং তদানুযায়ী একটি শ্রেণী হিসাবে এর নিজের বিলোপ করবে।

ইহার শ্রেণীগুলি ও শ্রেণী বৈরীতা সহ বুড়ো বুর্জোয়া সমাজের স্থলে আমরা পাবো একটা সমিতি যাতে প্রত্যেকের স্বাধীন বিকাশের শর্ত হচ্ছে সকলের স্বাধীন বিকাশ। " - ইনফরমেশন সেন্টার ফর ওয়ার্কার্স ফ্রিডম কর্তৃক প্রকাশিত। @ www.icwfreedom.org

অতঃপর, বৈশ্বিক পুঁজিতন্ত্রকে একাকী কোনো দেশে প্রতিস্থাপন করা অসম্ভব হলেও লেনিনবাদীদের দাবীমতো একাকী শ্রমিক শ্রেণী কর্তৃক নয় বরং যেকোনো বাহিনী বা দল কর্তৃক প্রথমে একটি দেশেই পুঁজিতন্ত্রকে পরাজিত ও পরাভূত করে তাদের কথিত সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করে তারপর সমাজতন্ত্রের পরবর্তী সমাজ কমিউনিজম প্রতিষ্ঠা করা নয় বরং কমিউনিস্ট পার্টির ইস্তেহারের উপরোক্ত বক্তব্য মতে একটি বিশ্ব সমিতি সমেত কমিউনিজম হচ্ছে বুড়ো বুর্জোয়া সমাজের বিলুপ্তিতে দুনিয়ার সকল মানুষের স্বাধীন বিকাশের একটি মুক্ত সমাজ যেখানে কোনো শ্রেণী নাই তাই, শ্রেণী শোষণ নাই সুতরাং, শোষণের স্বার্থে , শোষকদের সৃষ্ট মতাদর্শ, দর্শন, রাজনীতি, রাজনৈতিক দল ও রাষ্ট্র সমেত শ্রেণী শাসনের কোনো হাতিয়ার পুঁজিতন্ত্রের পরিণতি- কমিউনিজমে নাই । অতঃপর, দুনিয়ার শ্রমিকেরা সংগঠিত হয়ে একটি বিপ্লবের মাধ্যমে শ্রেণী শোষণ ও শ্রেণী শাসনের সকল হাতিয়ার তথা জঞ্জালাদি দূর করতে, জঞ্জালগুলির ভিত্তি বুর্জোয়া উৎপাদন পদ্ধতিকে বলপূর্বক দূরীভূত করবে। সুতরাং, একাকী শ্রমিক শ্রেণী কর্তৃক একটি বিপ্লবের মাধ্যমে বুর্জোয়া উৎপাদন পদ্ধতি সমেত এই পদ্ধতির পক্ষীয় সকল জঞ্জাল বিলীন ও বিলুপ্ত করে কমিউনিজম প্রতিষ্ঠায় শ্রমিক শ্রেণীর আন্দোলন হচ্ছে কমিউনিস্ট আন্দোলন।

উল্লেখ্য, কমিউজিমের জন্য কমিউনিস্ট আন্দোলনকে গড়ে তোলা, সংগঠিত করা ও বিকাশের জন্য রচিত খোদ কমিউনিস্ট পার্টির ইস্তেহার নিজেই যেমন কমিউনিস্ট বিপ্লব সংঘটনে উপযুক্তভাবে সূত্রায়িত একটি সহায়ক পুস্তক এবং কমিউনিস্ট আন্দোলনের ফসল তেমন কমিউনিস্ট আন্দোলনের এক ঐতিহাসিক নজির। তবে, কিছু ভুল-ভ্রান্তি ও সীমাবদ্ধতা সহ এটি এখনো ভেলিড এন্ড এফেক্টিভ।

অতঃপর, কমিউনিস্ট আন্দোলন ছিল এবং আন্দোলনের জন্য প্রয়োজনীয় সাহিত্য রচিত এবং কিছু কিছু সীমাবদ্ধতা সহ সংগঠনও গড়ে উঠেছিল। কিন্তু, বুর্জোয়াদের দমন-পীড়ন ও নানান রাজনৈতিক চাল-চাতুরীতে তৎকালীন সংগঠন বিলীন হয়। পরবর্তীতে, লেনিনের দল- সিপিএসইউ এবং লেনিনবাদী দল সিপিআই (এম) ইত্যকার দলগুলি তাদের কমিউনিস্ট বিরোধী অপতৎপরতা ও দুস্কর্মকে গ্রাহ্যতা দিতে এবং শ্রমিক শ্রেণীকে বিভ্রান্ত করতে কমিউনিস্ট পার্টির ইস্তেহার সহ সমাজতন্ত্রের বিজ্ঞানের সাহিত্য বিকৃত এবং জালও করেছে ।

উল্লেখ্য, মানুষে মানুষে ভাগ-বিভাজন, বিভেদ-বৈরীতা, অসাম্য-বৈষম্য,হিংসা-দ্বেষ,ঘৃণা-হীনমন্যতা, সংকীর্ণতা-স্বার্থপরতা, দখল-বেদখল ও জবরদখল, চুরি-ডাকাতি, দস্যুতা-লুণ্ঠন, দমন-অবদমন,শোষণ-শাসন ইত্যকার দুস্কর্মের কারণ ব্যক্তিমালিকানার ভিত্তিতে গঠিত দাস সমাজ হতে সামন্ত সমাজ পর্যন্ত মানুষে মানুষে সমান এই কথাটা জেনে-বুঝে তেমন সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সম্ভব ছিল না। যদিচ,ভাগ-বিভাগ, শোষণ, শাসন ও বৈষম্য-বৈরীতায় ক্ষুব্ধ হয়ে স্পার্টাকাসরা বিদ্রোহ করেছিল। কিন্তু, অগণন পণ্যের পুঁজিতান্ত্রিক সমাজের অন্যোন্য-নির্ভরতার সম্পর্কাধীন সামাজিক ও সমতাবাদী শ্রমে উৎপন্ন সমতাবাদী পণ্য উৎপাদনী প্রক্রিয়া হতে মানুষে মানুষে সমতার

চিন্তা ও বোধ জন্ম নিতে থাকে এবং বৈজ্ঞানিকভাবেও প্রমাণিত হয় যে মানুষ জন্মগত উপাদানেও সমান। আর পণ্যের বেচা-কেনার স্বার্থে তথা পুঁজির অস্তিত্বের শর্ত দুটির একটি অর্থাৎ সঞ্চালনের শর্তে পুঁজিপতি শ্রেণী উপনিবেশিকতার নীতি অনুশীলন করে সমগ্র দুনিয়াকে জয় ও পুঁজিতন্ত্রী ধাঁচে গড়ে তোলে। তাইতো, বৈশ্বিক পুঁজিতন্ত্রের পরিণতি-কমিউনিজম যে মানুষে মানুষে সমতার তথা সমানদের একটি বৈজ্ঞানিক সমাজ তবে কোনো একক দেশে তা প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নয়, তা সূত্রায়িত করতে সক্ষম হয়েছেন মার্কস ও এ্যাংগেলস যথার্থভাবে। পুঁজির কোড এবং সমাজ পরিবর্তনের কোড আবিষ্কারের মাধ্যমে কমিউনিজমের বিজ্ঞান আবিষ্কার করেছেন মার্কস আর তা ব্যাখ্যা করেছেন এ্যাংগেলসও। তবে, মার্কসদের আগেও অনেকেই সমাজতন্ত্র নিয়ে নানান সাহিত্য রচনা করেছেন, আন্দোলন করেছেন। কিন্তু, সেসব ছিল সমাজতন্ত্রের কাল্পনিক ধারণা তথা মার্কসদের পূর্বেকার সমাজতান্ত্রিক সাহিত্য ছিল কাল্পনিক সমাজতন্ত্রের সাহিত্য।

কমিউনিস্ট পার্টির ইস্তেহার; পুঁজি; পরিবার, ব্যক্তিগত মালিকানা ও রাষ্ট্রের উৎপত্তি ; সমাজতন্ত্রঃ কাল্পনিক ও বৈজ্ঞানিক; ফ্রান্সে শ্রেণী সংগ্রাম; ফ্রান্সে গৃহযুদ্ধ ইত্যাদি সহ মার্কস ও এ্যাংগেলসের রচিত সাহিত্য যেমন মজুর শ্রেণীর মধ্যে ইতিবাচক ফলাফল ঘটাতে সহায়ক হল তেমন কমিউনিস্ট লীগ ও পরবর্তীতে আন্তর্জাতিক শ্রমজীবী মানুষদের সমিতি- প্রথম আন্তর্জাতিক গঠন এবং সংগঠন দুটির আন্দোলন বুর্জোয়া শ্রেণীকে ভীত ও আতংকিত করেছিল। ফলে, ফ্রান্স, জার্মান সহ দেশে দেশে চরম দমন-পীড়ন চালিয়ে শেষত প্রথম আন্তর্জাতিককেও বিলীনে সমর্থ হয়েছিল হিংস্র বুর্জোয়া শ্রেণী। কিন্তু তাতেও ভয় মুক্ত হয়নি বুর্জোয়া শ্রেণী। তাইতো, দমন-পীড়ন ছাড়াও মার্কসদের জীবদ্দশাতেই কমিউনিস্ট ইস্তেহারকেও বিকৃত করেছিল জাল-জালিয়াতিতেও পটু বুর্জোয়াদের রাজনীতিক জার্মানীর লাসালও।

লাসালীয়দের সাথে নিয়ে বেড়ে ওঠা জার্মান স্যোসাল ডেমোক্রেটিক পার্টি সহ দুনিয়ার ২০টি দেশের লেবর ও স্যোসালিস্ট পার্টি মিলে ১৮৮৯ সালে প্রতিষ্ঠা করে ২য় আন্তর্জাতিক। প্রতিশ্রুতি ছিল ১ম আন্তর্জাতিকের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে কাজ করা। উল্লেখ্য, প্রথম আন্তর্জাতিকের ১৮৬৪ সালের সাধারণ নিয়মাবলীতে যা বিবৃত হয়েছে তা হচ্ছে এই: " যেহেতু শ্রমিক শ্রেণীর মুক্তি অবশ্যই অর্জিত হবে শ্রমিক শ্রেণীর নিজেদের কর্তৃক; শ্রমিক শ্রেণীর মুক্তির জন্য সংগ্রাম যার অর্থ শ্রেণী সুবিধা ও একচেটিয়ার জন্য সংগ্রাম নয় তবে, সমান অধিকার ও দায়িত্বের জন্য, এবং সকল শ্রেণী শাসনের বিলোপ সাধন;

শ্রমের উপায়ের একচেটিয়াকারীদের নিকট শ্রমের মানুষের অর্থনৈতিক অধীনতা, অর্থাৎ জীবনের উৎস, দাসত্বের সকল রূপের তলদেশে অবস্থান করে, সকল সামাজিক দুর্দশা, মানসিক অপকৃষ্টতা, এবং রাজনৈতিক নির্ভরশীলতা;

অতঃপর, শ্রমিক শ্রেণীর অর্থনৈতিক মুক্তি হচ্ছে সেসবের চরম সমাপ্তি যাতে প্রতিটি রাজনৈতিক আন্দোলন একটি উপায় হিসাবে অধস্তন হবে।

প্রত্যেক দেশে বহুমুখি শ্রম বিভাজনের মধ্যে সংহতির অভাব, এবং বিভিন্ন দেশের শ্রেণীর মধ্যেকার একটা ভ্রাতৃীয় বন্ধনের একীভবনের অনুপস্থিতিতে মস্ত সমাপ্তির উদ্দেশ্যে এ যাবৎকালের সকল প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে;

শ্রমিকের মুক্তি স্থানীয়ও নয়, জাতীয়ও নয় বরং একটা সামাজিক সমস্যা, সকল দেশের অন্তর্ভুক্ত যাতে আধুনিক সমাজ বিদ্যমান, এবং ইহার সমাধানের জন্য নির্ভরতা হচ্ছে খুবই প্রাগ্রসরমান দেশগুলির তাত্ত্বিক ও প্রায়োগিক ঐক্যমত।

ইউরোপের সর্বাধিক কর্মোদ্যোগী দেশগুলোতে শ্রমিক শ্রেণীর বর্তমান পুনরুভ্যুদয়, যখন একটা নতুন আশার জাগ্রত করেছে, পুরোনো ভুলের মধ্যে পতিত হওয়ার বিষয়ে গম্ভীরভাবে সতর্ক করছে এবং এখনো বিচ্ছিন্ন আন্দোলনগুলোর আশু সংযুক্তির আহবান জানাচ্ছে;

সেহেতু– শ্রমজীবী মানুষের আন্তর্জাতিক সমিতি প্রতিষ্ঠিত হল। ”

অতঃপর, অতীতের বিচ্ছিন্ন, বিভক্ত ও ব্যর্থ শ্রমিক আন্দোলন নয় বা দুনিয়ার শ্রমিকদের মধ্যে ঐক্যবিহীন ও সংহতিহীন আন্দোলন নয় বরং দুনিয়ার শ্রমিকদের সংঘবদ্ধ আন্দোলনের মাধ্যমে শ্রমিক শ্রেণীর মুক্তি তথা পুঁজিতন্ত্র বিলীন করে একটি নতুন সমাজ– যেখানে শ্রেণী ও শ্রেণী শাসন থাকার সুযোগ নাই তা প্রতিষ্ঠা করবে একা শ্রমিক শ্রেণী। শোষণহীন সেই নতুন সমাজ প্রতিষ্ঠা করতে দুনিয়ার মজুরদেরকে একতাবদ্ধ করতে গঠিত প্রথম আন্তর্জাতিকের নীতি ও লক্ষ্য বাস্তবায়নে দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকও গঠিত হয়েছিল অন্তত দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের প্রতিষ্ঠাকালীন প্রতিশ্রুতিমতো। শ্রমিক শ্রেণীর মুক্তি যে কোনো স্থানীয় বা জাতীয় সমস্যা নয় বরং একটি সামাজিক সমস্যা যা সমাধানে অগ্রসরমান দেশগুলির মজুরদের সম্মিলিত ক্রিয়া আবশ্যক তাহাও সুস্পষ্টভাবে বিবৃত হয়েছে বর্ণিত নীতি মালায়। তাই, কমিউনিস্ট আন্দোলন হচ্ছে শ্রমিক শ্রেণীর মুক্তির আন্দোলন। অতঃপর, এর সফলতা নির্ভর করে দুনিয়ার শ্রমিকদের একতা ও সংহতির উপর।

উল্লেখ্য, প্রথম আন্তর্জাতিকের আগে কমিউনিস্ট আন্দোলন গঠন ও বিকাশে গড়ে উঠা কমিউনিস্ট লীগের নিয়ামাবলীতেও বলা হয়েছে যা এই: “ সেকসন–১। লীগ– অনু।১। লীগের লক্ষ্য হচ্ছে বুর্জোয়াদের উৎখাত করা, প্রলেতারিয়েতের শাসন, শ্রেণীগুলোর স্বক্রিয় বৈরীতার উপর নির্ভরশীল এবং ব্যক্তিগত সম্পত্তিহীন ও শ্রেণীহীন একটি নতুন সমাজের ভিত্তি বৃদ্ধ বুর্জোয়া সমাজের বিলোপ সাধন। ” অর্থাৎ ‘বৃদ্ধ’ পুঁজিতন্ত্রকে বিলীন করে উৎপাদন ও বিনিময়ের উপায়াদির সামাজিক মালিকানার নতুন সমাজ– সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য দুনিয়ার শ্রমিকদেরকে একতাবদ্ধ করতে গঠিত হয়েছিল কমিউনিস্ট লীগ।

অতঃপর, ২য় আন্তর্জাতিকও কমিউনিজম প্রতিষ্ঠায় দুনিয়ার শ্রমিকদেরকে একতাবদ্ধ করবে এটাইতো ছিল স্বাভাবিক। কিন্তু, জার্মান স্যোসাল ডেমোক্রেটিক পার্টি, যে পার্টি ১ম বিশ্বযুদ্ধোত্তর পরাজিত জার্মানীর রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় আসীন হয় সে পার্টি সহ নানান দেশের নানান পার্টি নিয়ে গঠিত হওয়া ২য় আন্তর্জাতিক স্বীয় প্রতিষ্ঠাকালে ঘোষিত সেই স্বাভাবিক কাজ করেনি।

উল্লেখ্য, প্যারি কমিউন ধ্বংস ও কমিউন প্রতিষ্ঠাকারীদের গণহারে হত্যা করার ইতিহাসের ভিলেন জার্মানী অর্থাৎ ফ্রান্স-জার্মান যুদ্ধে পরাজিত এবং জার্মানীর নিকট বন্দী ফ্রান্সের ডিক্টেটর নেপোলিয়নের পক্ষে গুন্ডাগীরি করার গুন্ডাভাতার সুবিধাভোগী জার্মানী শিল্প-কারখানায় সমৃদ্ধ হলেও দুনিয়াটা ছিল বৃটিশ সহ অপরাপর প্রাগ্রসর দেশের বুর্জোয়াদের কলোনী। অতঃপর, জার্মান পুঁজিপতিদের পুঁজির সঞ্চালন শর্তে আদি পুঁজিপতিদের দখলাধীন বিশ্ব বাজারে জার্মানীর অনুপ্রবেশ করার আবশ্যকতা প্রকট হতে প্রকটতর হয়। জার্মান ফ্রেন্ডস সমিতির নামে দেশে দেশে জার্মানের পক্ষে তবে বৃটিশ, ফ্রান্স ইত্যকার কলোনিয়াল শক্তির বিপক্ষে ভাড়াটিয়া নিয়োগ করেছিল জার্মান রাজা । আবার, কলোনি দখল-বেদখল নিয়ে বৃটিশ পুঁজিপতিদের সাথে ফ্রান্স সহ অন্যান্য শিল্প সমৃদ্ধ দেশের পুঁজিপতিদের বিরোধ-যুদ্ধতো ছিল শিল্পোন্নত ইউরোপের নৈমত্তিক বিষয়। বলা হয়ে থাকে যে, বৃটিশ-ফ্রান্স এর মধ্যকার ৭ বছর মেয়াদী যুদ্ধে ফ্রান্সের বিজয় আমেরিকাকে বৃটেন হতে বিচ্ছিন্ন করার অর্থনৈতিক কারণ যোগিয়েছে। এসব যুদ্ধ এবং পুনঃপুন মন্দার ধারাবাহিকতায় ১৯০৩ সালের মহা মন্দা তথা পুঁজির সঞ্চালন সংকট মোকাবেলায় তথা পণ্যের বাজার দখল-বেদখল করতে জার্মানী আক্রমণকারীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ (১৯১৪-১৯১৮) সংঘটিত করেছে। পুঁজির অস্থিত্বের শর্তদ্বয়- (১) পুনরুৎপাদন; এবং (২) সঞ্চালন শর্তে পুঁজিপতি শ্রেণী মন্দায় আক্রান্ত হয়ে মন্দা মোকাবেলায় যুদ্ধ সহ যে সব পন্থা অবলম্বন করে তাতে পুঁজিতন্ত্রের নিরাময় অযোগ্য ব্যাধি- মন্দার সমাধানতো হয় না বরং পুঁজিতন্ত্র ও পুঁজিপতি শ্রেণীর সংকট আরো বাড়ে। তাইতো, পুঁজিপতি শ্রেণী দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ করে মানবজাতির অপূরণীয় ক্ষতি সাধন করে পুঁজিতন্ত্রী বিশ্বায়নের রাজনীতির দ্বারস্ত হয়েও যেমন পুঁজিতন্ত্রের তেমন পুঁজিপতি শ্রেণীর সংকট ও সমস্যা বাড়ানো বৈ কমাতে পারেনি বলেই আজকের করোনা কালে চরম হযবরল অবস্থা চলছে।

কতিপয় নেতার বিরোধীতা সত্ত্বেও ১ম বিশ্বযুদ্ধের কারণ- ১৯০৩ সালের মহামন্দার আগে ১৮৯৬ সালে দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক লন্ডন কংগ্রেস উপনিবেশ বিরোধী তথাকথিত জাতিয় মুক্তি বা জাতীয় আত্ম নিয়ন্ত্রণ অধিকার প্রতিষ্ঠার রাজনীতি গ্রহণ করার মাধ্যমে দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের প্রতিষ্ঠাকালীন প্রতিশ্রুতি ভংগ করে কার্যত কমিউনিস্ট তথা শ্রমিক শ্রেণীর মুক্তি আন্দোলনকে আড়াল ও ভূলুণ্ঠিত করে আদি ও নব্য পুঁজিপতিদের মধ্যকার বিরোধে বনেদিদের বিপক্ষে তবে, আদিদের পুঁজির অস্তিত্বের শর্তে সৃষ্ট দেশে দেশে প্রতিষ্ঠিত পুঁজিপতিদের পক্ষাবলম্ভন করে কার্যত শ্রমিক শ্রেণীর সাথে বিশ্বাসঘাতকতা ও প্রতারণা করেছে পুঁজিপতিদের চরিত্রমতোই।

উল্লেখ্য, কমিউনিস্ট ইস্তেহারের ২য় অধ্যায়ে পরিষ্কার করে বলা হয়েছে যে, সমগ্রভাবে শ্রমিক শ্রেণীর স্বার্থ ছাড়া বা পৃথক কোনো স্বার্থ কমিউনিস্টদের নাই। আরো বিবৃত আছে যে শ্রমিকদের কোনো জাতি নাই, দেশ নাই বরং শৃংখল হারিয়ে জয় করার জন্য তাদের আছে একটি বিশ্ব। উপরন্ত, এটাও বলা হয়েছে যে, বুর্জোয়াদের বিকাশ, বাণিজ্যের স্বাধীনতা, বিশ্ব বাজারে , উৎপাদনের সমরূপতায় এবং জীবনের অবস্থাবলীর সহিত সংগতিপূর্ণভাবে অধিক হতে অধিকতরভাবে প্রতিনিয়তই জনগণের মধ্যেকার জাতিগত পার্থক্য ও বৈরীতা অদৃশ্য হচ্ছে। শ্রমিকদের আধিপত্য সেসব পার্থক্য ও বৈরীতার অদৃশ্য হওয়ার কারণ হবে অর্থাৎ জাতি ও জাতীয়তা বিলীন হবে। সুতরাং, কমিউনিস্ট সমাজ যে জাত,জাতি, উপজাতি, বর্ণবাদ, সেক্সসিজম,ফ্যামিনিজম, দেশপ্রেম,ভাষাপ্রেম ইত্যাকার ভাগ-বিভাজক, ক্ষতিকর ও হিংস্র ধারণা যা মানুষে মানুষে ভাগ-বিভাজন এবং বৈরীতা ও বৈষম্য সৃষ্টির রাজনৈতিক বোধ সেসব নোংরা-বিশ্রী তথা রাজনৈতিক বোধ হতে মুক্ত। তাই,কমিউনিজম বৈষম্য-বৈরীতা ও ভাগ-বিভাজন মুক্ত অতঃপর, পরিপূর্ণ মানবিক বোধ সম্পন্ন বিজ্ঞানী মানুষদের ভালোবাসার জন্য ভালোবাসার মিষ্টি-মধুর বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কের একটি একক ও অখন্ড মানবজাতির সমাজ তাতো সমতার চিন্তার যোগানদাতা পণ্য উৎপাদন পদ্ধতিরই ফলাফল।

অতঃপর, শ্রমিক শ্রেণীর মুক্তির লড়াইকে শিকেয় তুলে এবং পুঁজির জন্ম সূত্রে শোষক পুঁজিপতি শ্রেণীর সহিত শোষিত মজুর শ্রেণীর বিরোধকে বাতিল ও অস্বীকার করে প্রকৃতপক্ষে শ্রমিক শ্রেণীর শ্রেণী পরিচয় মুছে দিয়ে জাত-জাতির সদস্য হিসাবে চিহ্নিত ও দেশ-জাতির ভিত্তিতে ভাগ-বিভাগ করার নীতি তথাকথিত জাতীয় মুক্তির রাজনীতি চর্চা করতে গিয়ে ২য় আন্তর্জাতিকের সদস্য দলগুলো নিজ নিজ দেশ তথা সরকারের পক্ষ নিয়ে ১ম বিশ্বযুদ্ধে ক্ষেত্রবিশেষ পরস্পরের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছে বলে ১ম বিশ্বযুদ্ধ কালে ২য় আন্তর্জাতিকেরও বিলুপ্তি ঘটে। সুতরাং, দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের প্রতারক নেতাদের দুস্কর্ম তথা কথিত জাতীয় মুক্তির রাজনৈতিক লাইনের কারণে দুনিয়ার মজুরেরা কেবল একতা অর্জনের সুযোগ হতেই বঞ্চিত হয়নি বরং তথাকথিত দেশপ্রেম ও জাতীয়তাবাদের রাজনীতির মাদকেও আসক্ত হয় উক্ত দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের বদৌলতেই।

কমিউনিজমের জন্য কমিউনিস্ট পার্টি নয় বরং কমিউনিজম বিরোধী রাজনৈতিক নীতি তথা দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের গৃহীত তথাকথিত জাতি সমূহের আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকারের রাজনীতি; পুঁজিতন্ত্রের স্বপক্ষে তখনকার সময়ে নিউজিল্যান্ডের মজুরদের চেয়েও রাশিয়ার মজুরদের জন্য কম মজুরী ও কম সুযোগ সুবিধার কর্মসুচি সমেত প্রতিক্রিয়াশীল কৃষকদের স্বার্থাধীন কর্মসূচিসহ মোট ৩৫ দফা কর্মসূচি: এবং গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা সমেত রাশিয়ায় পুঁজিতন্ত্রী পদ্ধতির বিকাশ সাধনে ১৯০৩ সালে রুশ স্যোসাল ডেমোক্রেটিক লেবর পার্টি প্রতিষ্ঠা করতে নির্ণায়ক ভূমিকা পালনকারী লেনিন গণতান্ত্রিক কেন্দ্রীকতা তথা কেন্দ্রীয় অর্থাৎ ক্ষমতাধর ব্যক্তির একচ্ছত্র কর্তৃত্ব নিশ্চয়তার সাংগঠনিক নীতি গ্রহণ করতে গিয়ে প্রতিষ্ঠা কালীন কংগ্রেসে একদম অযৌক্তিকভাবে তবে বুর্জোয়া কোম্পানীর শেয়ার ভিত্তিক পদ-পদবী প্রাপ্তির মতো লেনিন নিজে সহ কয়েকজন ডেলিগেট দুই ভোটের মালিক হয়েও

কার্যত বুর্জোয়া নীতি এবং তদানুরূপ উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য পূরণ ও প্রতিষ্ঠার একটি ঘোষণাপত্র সহমতে গ্রহণ করেও কার্যত প্রতিযোগিতা ও বিভাজনের বুর্জোয়া নীতিরই ফলশ্রুতিতে প্রতিষ্ঠাকালেই পার্টিকে দ্বিখন্ডিত করে একই ঘোষণার দুই পার্টির একটির তথা প্রতিক্রিয়াশীল পুঁজিতন্ত্রী বলশেভিক পার্টির একক ও একচ্ছত্র নেতা বনে গেলেন লেনিন। সেই প্রতিক্রিয়াশীল বলশেভিক পার্টির হয়ে কথিত দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকেরও নেতা বনে গেলেন লেনিন। লেনিনবাদীরা একই ঘোষণার আরেকটি দল–মেনশেভিক পার্টিকে উচ্চস্বরে পুঁজিতন্ত্রী দল বলে সেই দলের নেতাদের গালাগাল দিলেও একই রাজনীতি প্রতিষ্ঠার বলশেভিক পার্টিকে যেমন হাল আমলের কথিত কমিউনিস্ট পার্টির কার্যত লেনিনবাদী দলগুলোর আদিপার্টি বা উৎসভূমি বলে দাবী করে লেনিনকে কেবল দুনিয়ায় প্রথম সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠাকারী বলেই ক্ষান্ত হয় না বরং মার্কসদের তত্ত্বায়িত তত্ত্বগুলোর সফল বাস্তবায়নকারী বলে তাকে 'মহামতি' লেনিন হিসাবে বিশেষায়িত করে তাদের কথিত মহাগুরু মার্কসের যোগ্য ও উপযুক্ত শিষ্য হিসাবে লেনিনকে উপস্থাপন করে কেবল রাজনৈতিক স্বার্থান্ধতাই নয় বরং রাজনীতির নোংরামির নিদানমতো চরম দ্বিচারিতা করেই যাচ্ছে কার্যত দাসতান্ত্রিক সমাজের রাজনৈতিক বোধে। তাইতো, লেনিনবাদীরা যুগপৎ স্বেচ্ছাচারী ও দাসোচিত চিন্তার ধারক–বাহক। উল্লেখ্য, সমতার সমাজতন্ত্রতো নয়ই বরং দাসোচিত বোধের ব্যক্তিরা এমনকি বুর্জোয়া গণতন্ত্রেরও উপযুক্ত নয়।

প্রথম বিশ্ব যুদ্ধের সুযোগে বিক্ষুব্ধ ও দলীয় সমর্থক সেনাদের দিয়ে রাতের বেলায় এক সেনা অভ্যুত্থানে রাশিয়ার রাষ্ট্র ক্ষমতা দখল করে লেনিন তার নিজের সরকারের নিয়ন্ত্রণে তার নিজের পার্টিরও দীর্ঘকালীন দাবী মতো অনুষ্ঠিত সংবিধান সভার নির্বাচনে গো হারা হেরে তারই দেয় পূর্বেকার নিদানের বিধানমতে অন্যায় ও বেআইনীভাবে নির্বাচিত সংবিধান সভা ভেংগে দিয়ে নিজেই একটি সংবিধান রচনা করে সেই ১৯১৮ সালের সংবিধান মতো একটি রাষ্ট্রীয় পুঁজিতান্ত্রিক রাষ্ট্র গঠন করে এবং সেটি যে সমাজতন্ত্র নয় তা জেনে–বুঝে সম্পূর্ণত রাজনৈতিক বদ মতলবে ও উদ্দেশ্যমূলকভাবে এবং প্রতারণামূলে সেটিকে দুনিয়ার প্রথম সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র হিসাবে ঘোষণা করে লেনিন। আবার, রাতের বেলার সামরিক অভ্যুত্থানকে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব হিসাবে জাহির করে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব বিষয়ে সমাজতন্ত্রের বিজ্ঞানকে আড়াল কার্যত অস্বীকার করে শ্রমিকদের মধ্যে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করেছে। কিন্তু, সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব যে কেবল মজুর শ্রেণীর কাজ এবং সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পরিসীমা যে স্থানীয় বা জাতীয় নয় বরং বিশ্বজনীন এবং রাষ্ট্রীয় পুঁজিবাদ যে পুঁজিতন্ত্রেরই একটি রূপ তাতো অজানা ছিল না লেনিনেরও।

পুঁজিপতিদের মধ্যে প্রতিযোগিতা, বিরোধ, সংঘাত ও যুদ্ধ একটি স্বাভাবিক বিষয়। অতঃপর, প্রথাগত পুজিতন্ত্রীদের সাথে রাষ্ট্রীয় পুঁজিতন্ত্রীদের বিরোধ খুবই স্বাভাবিক। অথচ, সংবিধান সভায় সংখ্যাগরিষ্ঠ আসন লাভকারীদের প্রতিশ্রুত সংবিধান প্রণয়ণে সরকার গঠনের অধিকার হতে বঞ্চিত করতে নির্বাচকদের কলা দেখিয়ে নির্বাচিত সংবিধান সভাকে অনধিকারে " মহামতি" লেনিন বিলুপ্ত করে ভোটে বিজয়ীদেরকে দমন–পীড়ন করে যখন যুদ্ধে ঠেলে দিলেন, তখন সংবিধান সভার নির্বাচনে

বিজয়ীরা সহ তাদের সমর্থক যুক্তরাজ্য সমেত নানানদেশের বুর্জোয়াদেরকে লেনিন তার কথিত সমাজতন্ত্রের বিরোধী বলে প্রচার করেই ক্ষান্ত হয়নি বরং রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখলে লেনিনের পরের ব্যক্তি সাবেক মেনশেভিক নেতা ট্রটস্কি সমেত দেশে দেশে রাষ্ট্রীয় পুঁজিতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় জাতীয় মুক্তির রাজনীতির নানান দেশীয় দল নিয়ে ১৯১৯ সালে প্রতিষ্ঠা করেন তথাকথিত ৩য় আন্তর্জাতিক যাকে উদ্দেশ্যপূর্ণভাবে কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিক বলতে সংকোচবোধ করেনি কমিউনিস্ট লীগ ও প্রথম আন্তর্জাতিকের নীতি-লক্ষ্য ও নিয়মাবলী জানা লেনিন-ট্রটস্কিরা। যুক্তরাজ্য, যুক্তরাষ্ট্র সহ প্রথাগত পুঁজিতন্ত্রীদের মোকাবেলা করে টিকে থাকতে কথিত ৩য় আন্তর্জাতিক গঠন করা এবং জার্মানী সহ প্রতিবেশীদের সহযোগিতায় টিকে থাকতে তাদের সহযোগিতা নিতে লেনিনের রাশিয়ার বাজার মন্দায় আক্রান্ত জার্মানীর জন্য খুলে দিয়ে এবং যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ বাবত বিশাল সম্পত্তি সহ নগদ অর্থ ১৯১৮ সালের চুক্তি মতো জার্মানকে প্রদান এবং দেশীয় ক্ষেত্রে জারের আমলাদের বেশী বেতন-ভাতা দিয়ে এবং সেনাদের তবে সেনাকর্তাদের কেবল অধিকতর আর্থিক সুবিধাই নয় বরং রাজনৈতিক ক্ষমতায় যুক্ত করে নিজ দেশের মজুরদেরকে যুক্তরাষ্ট্রের মজুরদের অপেক্ষা অধিকহারে শোষণ করে টিকে থাকার জন্য ভারত, চীন সহ দেশে দেশে প্রতিক্রিয়াশীল কৃষক সহ গড়ে তোলে লেনিনবাদী প্রতিক্রিয়াশীল দল। কিন্তু, নামে বা বোলে চালে এগুলি দাবী করে আসছে কমিউনিস্ট পার্টি বলে।চীন, ভিয়েতনাম, সহ নানান দেশে এরা ক্ষমতাসীন হয়েছে সোভিয়েত রাষ্ট্র ও সেভিয়েত পার্টির সমর্থন ও সহযোগিতায় আর পূর্ব জার্মানি সহ ইউরোপের বেশ কিছু দেশতো উপঢৌকন হিসাবে লাভ করেছেন স্তালিন ২য় বিশ্ব যুদ্ধ সূচনাকারী জার্মান জাতীয়তাবাদের হিংস্র পান্ডা হিটলারকে যুদ্ধের শুরুতে সমর্থন যোগালেও পরবর্তীতে সহযোগীতা করার গোপন চুক্তি ভংগ করে সময় ও সুযোগ বুঝে অবস্থান পরিবর্তন করে আদি পুঁজিপতিরা তথা যুক্তরাজ্য সমেত কলোনিয়াল পুঁজিপতিদের জোটে প্রকাশ্যে যোগদান ও যুদ্ধে অংশী হয়ে জার্মানীকে পরাজিত করে। সোভিয়েত ও জার্মানীর গোপন চুক্তি এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ সমাপ্তির চুক্তিপত্র এদ্বিষয়ে প্রামাণ্য দলিল বটে। কিন্তু,লেনিনবাদী ক্রিয়াদিকে কমিউনিস্ট আন্দোলন বলে প্রচার করেই যাচ্ছে লেনিনবাদী দলগুলো ও তাদের বিরোধী পক্ষ প্রথাগত পুঁজিতন্ত্রের দলগুলি এবং উভয় পক্ষের সমর্থক বা ভাড়াটিয়া লেখকেরা সম্মিলিতভাবে। সোভিয়েতের পতনের পরও বুর্জোয়ারা সমাজতন্ত্রের পতন বলে জাহির করে প্রথাগত পুঁজিতন্ত্রের চিরস্থায়ীত্বের কল্প-কথা রচনা ও রটনা করেই যাচ্ছে। তাতে উভয় পক্ষ তথা পুঁজিতন্ত্রের সুবিধা হচ্ছে । কমিউনিজমের আতংক হতে নিরাপদে থাকতে প্রতিক্রিয়াশীল পুঁজিপতি শ্রেণী জেনে-বুঝে তবে উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে এমন মিথ্যা-ভুয়া ও বানোয়াটি প্রচারণা চালিয়ে যাচ্ছে।

আবার, লেনিনবাদীরা লেনিনের অনুগমনে রাষ্ট্রীয় পুঁজিতন্ত্রকে সমাজতন্ত্র বলে সমাজতন্ত্রকে দেশ ভিত্তিক একটি সমাজ বা সাময়িক সমাজ বলে তা হাসিলে দেশে দেশে কথিত জাতীয় গণতান্ত্রিক / নয়া গণতান্ত্রিক বা জনগণতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার কাজকেও কমিউনিস্ট আন্দোলন দাবী করে আসছে। তাদের এসব নোংরামিতে কমিউনিস্ট মার্কস-এ্যাংগেলসদেরকে অবমূল্যায়িত করে মার্কসকে

নিজেদের গুরু সাজাতেও লজ্জা বোধ করছে না তারা । পণ্য থাকছে, পুঁজি থাকছে, বেচা-কেনা থাকছে, মজুরি দাসত্ব থাকছে, শোষণ ও শাসন থাকছে তবু সোভিয়েত বা চীন বা ভিয়েতনাম বা কিউবা নাকি সমাজতান্ত্রিক! পুঁজি গঠনে পণ্য উৎপন্নে শ্রম-শক্তির ক্রেতা হচ্ছে শোষক পুঁজিপতি। কথিত সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের প্রধান নির্বাহীরা হচ্ছে তাদের নিজ নিজ দেশের মজুরদের শ্রম-শক্তির প্রধান ক্রেতা। তাই, এসব দেশের প্রধান নির্বাহীগণ প্রত্যেকেই হচ্ছে শোষকদের গ্যাং লিডার বা রিং লিডার। তবু, এরা কমিউনিস্ট! দাসতন্ত্রের মাইথোলজির নবসংস্করণ নয় কি? তাইতো, এরা মূর্তি পূজা সহ ঘোষিত গুরুজীদের জন্ম-মৃত্যু বার্ষিকী উদযাপন করা সহ দাসতন্ত্রের প্রভুদের রাজনৈতিক বোধ, রীতি-নীতি, সংস্কার ও সংস্কৃতিও চর্চা করছে কমিউনিজমের নামে।

তবে, কমিউনিজম যে শ্রেণীহীন, শ্রেণী শাসনহীন তাই রাষ্ট্রহীন এবং শোষকদের সৃজিত ও বহাল কৃত সকল রীতি-নীতি, প্রথা-সংস্কার ও সংস্কৃতি হতে মুক্ত তাতো বিজ্ঞানী মার্কসরা উদ্ঘাটন , সূত্রায়ন ও ব্যাখ্যা করেছেন। তবে, রাজনৈতিক জালিয়াতি ও চাতুরালীমূলে লেনিনরা তাদের কথিত সমাজতন্ত্রের পরিণতি হচ্ছে কমিউনিজম তাও বলতে দ্বিধা করেনি মূলত,সমাজ পরির্তনের নিয়ম-নীতিকে অবলীলায় অস্বীকার করে। তবে, তাদের সমাজতন্ত্র কেন এবং কিভাবে কমিউনিজমে রূপান্তরিত হবে সে বিষয়ে খাপছাড়া দুয়েকটা বিবৃতি বৈ যুক্তিগ্রাহ্য কোনো সূত্র বা তত্ত্ব দিতে সক্ষমতা দেখাতে পারেনি। তাদের রাষ্ট্র গঠনের সংবিধানগুলোতেও তাদের রাষ্ট্র বিলুপ্ত করে রাষ্ট্রহীন-শ্রেণীহীন সমাজ তথা কমিউনিজম প্রতিষ্ঠার কোনো বিধান নাই। তাহলে? এবিষয়েও লেনিনরা মিথ্যাবাদী। সুতরাং, লেনিনবাদীরা কমিউনিস্ট নয়। তাছাড়া, পুঁজির বিনাশ বা বিলোপ করা বৈ যারা পুঁজি তা হোক কথিত জাতীয় বা দেশীয় পুঁজি বা দেশপ্রেমিকদের পুঁজির পক্ষে তারা যদি কমিউনিস্ট হয় তবে পুঁজিপতি শ্রেণীর পক্ষীয় কে? পুঁজিতো পুঁজিই এবং পুঁজি মানেই শোষণের ফল। তাই, পুঁজির পক্ষীয়রা পুঁজির সেবক-রক্ষক তথা পুঁজিতন্ত্রী । সুতরাং, দেশপ্রেম ও জাতীয় পুঁজির ফেরিওয়ালারা কার্যত পুঁজির গোলাম-পাহারাদার তাই, তারা পুঁজিতন্ত্রী বৈ কমিউনিস্ট নয়।

কমিউনিস্ট ইস্তেহারে বিবৃত হয়েছে যে, কমিউনিজম হচ্ছে পুঁজিবিহীন, পণ্য মুক্ত, বেচা-কেনা মুক্ত, পরিবার মুক্ত, শোষক-শাসক শ্রেণীদের সৃষ্ট সকল নীতি-নৈতিকতা, মূল্যবোধ, আদর্শ, রীতি-নীতি ও সংস্কৃতি ইত্যাকার জঞ্জাল হতে মুক্ত এক মানবিক ও চিরন্তন শান্তির সমাজ। তাই, মজুরি দাসত্বের অবসানের জন্য পুঁজি বিনাশী ও বিলোপকারী মজুরেরা হচ্ছে কমিউনিস্ট বিপ্লবী। সুতরাং, মজুরি দাসত্ব বিরোধী ও বিনাশী তাই,পুঁজি বিনাশী ও বিলোপকারীরা হচ্ছে কমিউনিস্ট।

আবার, পুঁজির প্রথম খন্ডে, দ্বিতীয় জার্মান সংস্করণের উত্তরভাষ, ২৪ জানুয়ারী , ১৮৭৩ সালে মার্কস লিখেছেন যে, “ ইতিহাসে যার প্রধান কাজ পুঁজিতন্ত্রী উৎপাদন-পদ্ধতির উচ্ছেদ এবং সমস্ত শ্রেণীর চূড়ান্ত বিলুপ্তি - সেই শ্রেণী হল প্রলেতারিয়েত। ” অর্থাৎ সেনাবাহিনী বা স্বশস্ত্র রাজনৈতিক বাহিনী বা প্রতিক্রিয়াশীল কৃষক বা কথিত দেশপ্রেমিক বুর্জোয়াদের জোটের মাধ্যমে রাষ্ট্র ক্ষমতা দখল করা নয়

বরং পুঁজির অস্তিত্বের শর্তে সৃষ্ট পুঁজিতন্ত্রের সংকটে কেবলমাত্র এবং একমাত্র শ্রমিক শ্রেণী পুঁজিতন্ত্রী উৎপাদন-পদ্ধতি তথা মজুরী শ্রমে পুঁজি গঠনে পণ্য উৎপাদন পদ্ধতির বিলোপ সাধন করে শ্রেণীহীন সমাজ প্রতিষ্ঠা করবে। অর্থাৎ পুঁজিতন্ত্রই হচ্ছে শেষ ও চূড়ান্ত শ্রেণী বিভক্ত সমাজ; এবং পুঁজিতন্ত্রের পরিণতি হচ্ছে কমিউনিজম অর্থাৎ পুঁজিতন্ত্র হচ্ছে কমিউনিজমের ভিত্তি।কাজেই,লেনিন ও লেনিনবাদীরা যে পুঁজিতন্ত্র, সমাজতন্ত্র এবং কমিউনিজম বিষয়ে সর্বৈব মিথ্যাচারী তাই, কমিউনিস্ট আন্দোলন বিরোধী তাতো নিশ্চিতভাবেই প্রমাণিত। উল্লেখ্য, শোষকেরা কেবল শোষকই নয় বরং শোষণ বিষয়েও মিথ্যাবাদী। লেনিন ও লেনিনবাদীরাও তাই।

রাষ্ট্রীয় পুঁজিবাদ যে পুঁজিবাদ তাতো এ্যাংগেলস তার ১৮৭৭ সালে লিখিত 'সমাজতন্ত্রঃ ইউটোপীয় ও বৈজ্ঞানিক' বইতে পরিষ্কার করেছেন। রাশিয়া বা দেশ বিশেষে পুঁজিতান্ত্রিক উৎপাদন পদ্ধতির বিকাশ নয় বরং উপরোল্লেখিত কমিউনিস্ট লীগের নিয়মাবলীর সাক্ষ্য মতো নিয়মাবলী রচনা কালেই পুঁজিতন্ত্র "বৃদ্ধ" আর সেই বুড়ো পুঁজিতন্ত্রে যে " আধুনিক উৎপাদন-শক্তির পরিচালনায় বুর্জোয়ারা আর সক্ষম নয়" তাই, " উৎপাদন ও বিনিময়ের বড় বড় প্রতিষ্ঠানগুলির জয়েন্ট-স্টক কোম্পানী, ট্রাস্ট, ও রাষ্ট্রীয় সম্পত্তিতে রূপান্তরের মাধমে প্রমাণ হয় সে কাজের জন্য বুর্জোয়ারা কী পরিমাণে অনাবশ্যক।" অতঃপর, বর্ণিত সিদ্ধান্তমূলক বক্তব্য যে পুঁজিতন্ত্রের ক্ষয়িষ্ণু অবস্থাকে নিশ্চিত করেছে তাতো প্রমাণিত। বর্ণিত বইটিতে এ্যাংগেলস আরো লিখেছেন- " আধুনিক রাষ্ট্র হল মূলত একটি পুঁজিতন্ত্রী যন্ত্র, পুঁজিপতিদের একটি রাষ্ট্র, সামগ্রীক জাতীয় পুঁজির একটি আদর্শ রূপ মূর্তি। উৎপাদন-শক্তিকে যতটা সে হাতে নিতে চায়, ততই সে সত্য করেই হয়ে উঠে জাতীয় পুঁজিপতি,ততবেশী অধিবাসীকে সে শোষণ করতে থাকে। শ্রমিকেরা মজুরি-শ্রমিক অর্থাৎ প্রলেতারীয় রূপে থেকে যায়। পুঁজিবাদী সম্পর্কের অবসান হয় না বরং চূড়ান্ত শীর্ষে তোলা হয়।"-(রচনা সংকলন, পৃষ্ঠা-১৪৪-১৪৫, প্রগতি প্রকাশন, মস্কো।) অতঃপর, এ্যাংগেলসের এমন বিবৃতি থাকা সত্ত্বেও লেনিন, স্তালিন, মাও, কিম, হু চি মিন, ফিদেলরা যে সমাজতন্ত্র ও পুঁজিতন্ত্র বিষয়ে জেনে-বুঝে মিথ্যাচার করেছে মজুরদেরকে বিভ্রান্ত ও বিভক্ত করে ক্ষয়িষ্ণু পুঁজিতন্ত্রকে রক্ষা করতে তাতো নিশ্চিত হয়। অতঃপর, বিপন্ন পুঁজিতন্ত্রকে সংরক্ষায় লেনিনবাদী মোড়ল স্তালিন পুঁজিতন্ত্রী বিশ্বায়নের রাজনীতি তথা পুঁজি-পণ্যের দুনিয়াময় অবাধ গমনাগমনে উপনিবেশিকতার নীতি অচল করে বিশ্ব ব্যাংক ও আই এম এফ সহ নানান বৈশ্বিক সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেছে যুক্তরাষ্ট্র ও যুক্তরাজ্য সহ ২য় বিশ্ব যুদ্ধ জয়ীদের সাথে মিলে-মিশে। ফলে, রাষ্ট্র সংখ্যা এখন দুই শতাধিক। কিন্তু, রাষ্ট্র গুলো নিজেদের রাজস্ব ও করনীতিও স্বাধীনভাবে নির্ধারণে সক্ষম নয় আই এম এফের শাসন-নিয়ন্ত্রণে। তাই, মার্কসের সংজ্ঞায়িত 'সাম্রাজ্যবাদ' তথা চূড়ান্ত অবস্থায় উপনীত রাষ্ট্র এখন ডিফ্যাংক্ট। সুতরাং, আই এম এফের নিয়ন্ত্রণে স্বাধীনভাবে আয়-ব্যয়ে অযোগ্য রাষ্ট্র গুলোতে গণতন্ত্রও ডেড বটে।

একই বইয়ের ১৩২ পৃষ্ঠায় এ্যাংগেলস লিখেন- " সে সময় থেকে কোনো বিশেষ প্রবুদ্ধ মস্তিষ্কের আকস্মিক আবিষ্কার হয়ে সমাজতন্ত্র আর রইলা না, তা হল প্রলেতারিয়েত ও বুর্জোয়া এই দুই

ঐতিহাসিকভাবে বিকশিত শ্রেণীর ভেতরকার সংগ্রামের ফল।" অতঃপর, পুঁজি গঠনে পণ্য উৎপন্নে শ্রম-শক্তির ক্রেতা ও বিক্রেতার বিরোধের পরিণতি হচ্ছে সমাজতন্ত্র যা পণ্যহীন ও পুঁজি মুক্ত তাই, মজুরি মুক্ত সুতরাং শোষণমুক্ত অতঃপর, শ্রেণী ও শ্রেণী শাসন মুক্ত তাই, রাষ্ট্র সহ শোষক-শাসক শ্রেণীর দমন-পীড়নের সকল অস্ত্র মুক্ত সমাজে মতাদর্শ, রাজনীতি,দর্শন, ইত্যাকার বিষয়গুলোর কোনো উপযোগিতা নাই অর্থৎ শোষকদের শোষণের স্বার্থে সৃষ্ট কোনো জঞ্জাল-আবর্জনাই থাকছে না কমিউনিস্ট সমাজে। অতঃপর, দুই শ্রেণীর বিরোধের শীর্ষ বিন্দু হচ্ছে কমিউনিস্ট বিপ্লব। এই বিপ্লবের মাধ্যমে মুক্তি অর্জনের জন্য দুনিয়ার শ্রমিকদের একতা হচ্ছে প্রথম শর্ত। এই শর্ত পূরণে দুনিয়ার শ্রমিকদেরেকে একতাবদ্ধ করতে শ্রমিক শ্রেণীর একটি পার্টি আবশ্যক। আর এই পার্টিই হচ্ছে কমিউনিস্ট পার্টি যে পার্টি কমিউনিজমের জন্য একটি কমিউনিস্ট বিপ্লবের জন্য দুনিয়ার শ্রমিকদেরকে একতাবদ্ধকরণে কাজ করবে। অতঃপর, শ্রমিক শ্রেণীর নিজের পার্টি - কমিউনিস্ট পার্টি কমিউনিজমের জন্য দুনিয়ার শ্রমিকদেরকে একটি শ্রেণী হিসাবে গঠন করার আন্দোলন করবে। শ্রমিক শ্রেণীর মুক্তির জন্য শ্রমিক শ্রেণীর এরকম আন্দোলন হচ্ছে কমিউনিস্ট আন্দোলন।

অতঃপর, কমিউনিস্ট আন্দোলন ও বিপ্লব একটি সচেতন ও সংগঠিত তবে শ্রমিক শ্রেণীর আন্দোলন। অথচ, জার্মান স্যোসাল ডেমোক্রাট পার্টির নেতা তবে দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের জাতীয় মুক্তির রাজনীতির বিরোধী এবং প্রথম বিশ্ব যুদ্ধে জার্মানীর সরকারকে সমর্থন করায় দল ত্যাগ করে স্পার্টাকাস লীগ প্রতিষ্ঠাকারী রোজা লুক্সেমবার্গ পুঁজি বিষয়ে নানান রচনা সহ নানান পুস্তক রচনা করেও কমিউনিস্ট বিপ্লব বিষয়ে উপরোল্লেখিত নীতির পরিবর্তে স্বতঃস্ফূর্ততার নীতি গ্রহণ করে তেমন একটি স্বতঃস্ফূর্ত আন্দোলনে অংশী হয়ে একদা তারই দলের সরকারী গুন্ডাবাহিনী কর্তৃক নৃশংসভাবে খুন হয়েছেন তার সহযোদ্ধা সমেত।তাছাড়া, দাস বিদ্রোহের নায়ক স্পার্টাকাসকে কমিউনিস্ট আন্দোলনে প্রতিস্থাপনের চিন্তাও কমিউনিস্ট সুলভ চিন্তা বলে গণ্য হতে পারে না।

লেনিনের কথিত বিপ্লবের সমর্থক তবে লেনিন যাদের শিশুসুলভ বিশৃংখলাকারী বামপন্থী বলে নিজ দল বা লেনিনীয় আন্তর্জাতিক হতে তাড়িয়ে দিয়েছে তাদের অনুগামীরাও নানার ধারায় ভাগ-বিভাগ হয়ে কাজ করছে। কিন্তু, বলশেভিক পার্টি হতে উৎপত্তিকৃত বা সে ধরণের রাজনীতির বাহক বা লেনিনের সামরিক ক্যুকে যারা সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব বলে বিবেচনা করে তারা কেহ সমাজতন্ত্রের বিজ্ঞানের মানদন্ডে কমিউনিস্ট আন্দোলনকারী হতে পারে না। একই কারণে লেনিনবাদী ট্রটস্কিপন্থীরাও না।

মার্কসদের আগেও ছিল তবে মার্কসদের সময়ে মতাদর্শবাদী বাকুনিন ও তার সমর্থক নৈরাজ্যবাদীরাও নিজেদেরকে রাষ্ট্র বিনাশী স্বাধীনতাপন্থী হিসাবে জাহির করে পুঁজি, ব্যক্তিমালিকানা, বিজ্ঞান বা কমিউনিজমের বিজ্ঞান, একা শ্রমিক শ্রেণী কর্তৃক কমিউনিস্ট বিপ্লব ইত্যাকার বিষয়গুলোকে আমলে না নিয়ে কার্যত অস্বীকার করে স্বাধীনতা ও মুক্তির প্রধান বাধা ও প্রতিবন্ধক হিসাবে রাষ্ট্রকে চিহ্নিত

করে কতিপয় সাহসী ব্যক্তি কর্তৃক রাষ্ট্র বিলীন করার কাজকে নৈরাজ্যিক কমিউনিস্ট কাজ বলে বিবেচনা করে আসছে। বুর্জোয়াদের নানান তরফ এই নৈরাজ্যবাদীদেরকেও কমিউনিস্ট বলে তাদেরকে কমিউনিস্ট আন্দোলনের একটি ধারা হিসাবে নৈরাজীবাদীদের মতোই প্রচার করে আসছে। কিন্তু, ব্যক্তিমালিকানা যে বিদ্যমান সকল মন্দ কাজ সহ স্বাধীনতা ও মুক্তির প্রধান প্রতিবন্ধক তা যেমন নৈরাজ্যবাদীরা স্বীকার করে না তেমন ব্যক্তিমালিকানা হতে উৎপত্তিকৃত রাষ্ট্র যে ব্যক্তিমালিকানার বিলোপন ছাড়া বিলীন হতে পারে না তাও স্বীকার করে না। তদপুরি, দাস ও সামন্ত সমাজ যে নিয়মে পরিবর্তিত হয়েছে সমাজ পরিবর্তনের সেই একই নিয়মেই পুঁজিতন্ত্রও যে রাষ্ট্র সহ তার সকল রাজনৈতিক হাতিয়ারাদি সমেত বিলুপ্ত হবে খোদ পুঁজি ও পুঁজিপতি শ্রেণীর অস্তিত্বের শর্তে সৃষ্ট উৎপাদনের হাতিয়াদির বিদ্রোহ তথা মন্দা এবং পুনঃপুন মন্দার হেতুবাদে পুঁজির স্রষ্টা শোষিত মজুর শ্রেনীর সহিত শোষক পুঁজিপতি শ্রেণীর সংঘাতের মাধ্যমে তথা শ্রমিক শ্রেণী কর্তৃক সংঘটিত কমিউনিস্ট বিপ্লবে তাও নৈরাজ্যবাদীরা স্বীকার করে না। কার্যত, নৈরাজ্যবাদীরা সামাজিক নিয়মকেও না মেনেই কাল্পনিক জগতের বাসিন্ধা বলেই নিজেদেরকে নৈরাজ্যবাদী বলে চিহ্নিত করছে। কিন্তু, সমাজ পরিবর্তনের নিয়ম-সূত্র মতোই পুজিতন্ত্র বিলীন হয়ে কমিউনিজম প্রতিষ্ঠিত হবে । তাই, সামাজিক নিয়মেই পুঁজিতন্ত্রের পতন ও কমিউনিজমের বিজয় সমানভাবে অনিবার্য। সুতরাং, নৈরাজ্যবাদ যে কমিউনিস্ট আন্দোলন নয় তাওতো নিশ্চিত।

মানুষকে মানুষ শোষণ করাটা হচ্ছে সবচাইতে নিকৃষ্ট প্রকৃতির কাজ; শোষণ বজায় রাখতে মানুষ কর্তৃক মানুষকে শাসন করা হচ্ছে সবচাইতে বর্বরতা; আর শোষণ ও শাসনের জন্য দমন-পীড়ন সমেত খুন- ধর্ষণ করা সবচাইতে জঘন্যতম হিংস্রতা । আর এই সবগুলো জঘন্য, হিংস্র, বর্বর ও নিষ্ঠুর এবং নিকৃষ্টতম অন্যায় কাজগুলোকে ন্যায্যতা ও গ্রাহ্যতা দিতে দাসতন্ত্রের শাসকদের দ্বারা সৃজিত নীতি ভিত্তিক বিবৃতি বা বিবরণ হচ্ছে রাজনীতি। তাই, জন্মসূত্রে রাজনীতি হচ্ছে শোষক শ্রেণীর স্বার্থ রক্ষা ও সংরক্ষার নীতি যা হচ্ছে ব্যক্তিমালিকানা হতে সৃষ্ট ও উদ্ভূত সকল প্রকার কুকর্ম, দুস্কর্ম ও অন্যায় কর্মাদির নীতিমালার সুপ্রিম নীতি। বুর্জোয়ারাও বুর্জোয়া সমাজে শোষক-শাসক শ্রেণী বিধায় শোষণ-শাসনের সেসব জঘন্য নীতিবোধে তথা হত্যা-খুন, হিংস্রতা-নিষ্ঠুরতা ও নির্মমতায় তারা চ্যাম্পিয়ন না হওয়ার কারণ নাই। সেজন্য ,হালের বুর্জোয়ারা দুনিয়ার মোট উৎপাদনের ২% কেবল সামরিক খাতে তথা যুদ্ধ করতে অর্থাৎ হত্যা, লুণ্ঠন, ধ্বংস, অগ্নি সংযোগ, ধর্ষণ ইত্যাদি সংঘটনের জন্য ব্যয় করে। তাছাড়া, আরো নানান সরকারী ও বেসরকারী স্বশস্ত্র বাহিনীর জন্য বুর্জোয়ারা যা খরচ করে থাকে তাও মোট উৎপাদনের ১% এর কম হবে না। উপরন্তও, বুর্জোয়ারা নিজেরাও গণতন্ত্রের কথা বলেও নির্বাচনে জাল-জালিয়াতি, কারচুপি, দুর্নীতি, অনিয়ম সহ জোর জবরদস্তি,ত্রাস ও সন্ত্রাস ইত্যাদি সবই কম-বেশ করে থাকে। তদুপরি, ক্ষমতাসীন দলের বিলোপন নয় তবে কেবল মাত্র নির্বাচিত সংখ্যা গরিষ্ঠ দলের নিকট ক্ষমতা হস্তান্তরেও কেবল গড়িমসি করাই নয় বরং সাম্প্রতিককালেও এরকম রাজনৈতিক সংকট হতে গৃহ যুদ্ধ সংঘটনের নজির কম নাই।

কিন্তু, দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক বা লেনিনীয় ধারার বাইরে বিশ্ব সমাজতান্ত্রিক দল গড়ে উঠে ১৯০৪ সালে লন্ডনে। দলটি বুর্জোয়াদের গণতান্ত্রিক নীতিবোধে সন্তুষ্ট ও আস্থাশীল হয়ে দেশে দেশে নির্বাচনের মাধ্যমে ভোটারদের রায়ে সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে শান্তিপূর্ণ ভোট বিপ্লবের মাধ্যমে দেশে দেশে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার কর্মসূচি নিয়ে কাজ করছে। অথচ, কি তখন আর কি এখন দুনিয়ায় এমন কোনো রাষ্ট্র নাই যেটি তার সংবিধান সমেত সংবিধান মূলে গঠিত রাষ্ট্রকে বিলুপ্ত করার কোনো বিধি-বিধান সংবিধানে সংযুক্ত করে সেই বিধি মতো নির্বাচন করে শ্রমিক শ্রেণী নয় বরং ভোটার তথা মজুরদের ও বুর্জোয়াদের একটা উল্লেখ্যযোগ্য অংশ তথা সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটার দ্বারা সমাজতান্ত্রিক কর্মসূচি সমর্থিত হলে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করার সুযোগ দিবে। তেমন নির্বাচন সুযোগহীন তবু, বিশ্ব সমাজতন্ত্রীরা সেই পথেই হাঁটছে কেবলই শান্তির কথা বলে। কিন্তু, স্বশস্ত্র শক্তির বলে বলীয়ান হিংস্র শোষক-শাসক শ্রেণী কখনোই যে শান্তিবাদী নয় তাও তারা বিবেচনায় নিতে অক্ষম। যদিও, তারা মার্কসদের সমগ্র রচনাদি বিবেচনায় না নিয়ে বা সমাজতন্ত্রের বিজ্ঞানের নিরীখে সামগ্রীকতার ভিত্তিতে পুঁজিতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রকে বিবেচনায় অসম্মত হয়ে মার্কসের দুয়েকটি 'যদি' যুক্ত তবে অবিশ্বাস্য বলে মার্কসদেরই খারিজ করা বক্তব্যকে চরম ও পরম বক্তব্য হিসাবে বিবেচনায় শান্তিপূর্ণ বিপ্লবের নীতি অনুশীলন করে যাচ্ছে। অথচ, কমিউনিস্ট ইস্তেহারের সমাপ্তি হয়েছে এইভাবে- "কমিউনিস্টরা তাদের অভিমত ও লক্ষ্য গোপন করাকে অসন্মানজনক মনে করে। তারা প্রকাশ্যে ঘোষণা করে যে তাদের অভীষ্ট অর্জিত হতে পারে কেবলমাত্র সমস্ত বিদ্যমান সামাজিক অবস্থার বলপূর্বক পরিসমাপ্তি ঘটিয়ে। একটা কমিউনিস্ট বিপ্লবে শাসক শ্রেণীগুলোকে সন্ত্রস্ত হতে দাও। প্রলেতারিয়েতের হারাবার কিছু নাই কেবল তাদের শৃংখল ছাড়া। জয় করার জন্য আছে একটি বিশ্ব।"

অতঃপর, পুঁজিতন্ত্র শেয়ার মার্কেট প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে ব্যক্তিমালিকানার মধ্যেই সামাজিক মালিকানার পথের সূচনা করে কার্যত পুঁজিতান্ত্রিক ব্যক্তিমালিকানার সমাপ্তির সূচনা করে খোদ পুঁজিতন্ত্র ও পুঁজিতন্ত্রী শ্রেণীর অনাবশ্যকতা নিশ্চিত করেছে। পুঁজির অস্তিত্বের শর্তে পুনরুৎপাদন করতে গিয়ে অতি উৎপাদন সংকট তথা মন্দা অর্থাৎ পুঁজির অস্তিত্বের অপর শর্ত সঞ্চালনকে সংকটগ্রস্ত করেছে ইচ্ছা নিরপেক্ষভাবে পুঁজিপতি শ্রেণী। ফলে, পুঁজিতন্ত্র মার্কসদের জন্মের আগে হতেই সংকটে ও সমস্যায় পড়ে কমিউনিস্ট ইস্তেহার রচিত হওয়ার আগেই পুঁজিতন্ত্র 'বুড়ো' হয়েছিল। তাই, পুঁজিতন্ত্র প্রতিস্থাপনের সাধারণ নীতি ঘোষিত হয়েছে কমিউনিস্ট ইস্তেহারেই; আবিষ্কৃত হয়েছে সমাজতন্ত্রের বিজ্ঞান ; এবং রচিত হয়েছে কমিউনিস্ট সাহিত্য।

কিন্তু, দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের প্রতারক মোড়ল গং ও পরবর্তীতে লেনিনেরা পুঁজিবাদের বিরোধীতার মুখোশে পুঁজিবাদকে টিকে থাকতে সহযোগিতা করলেও রাষ্ট্রীয় পুঁজিতন্ত্র যে পুঁজিতন্ত্রের সংকটের সমাধানে সক্ষম নয় তাই পুঁজিরই নিয়মে পুঁজিতান্ত্রিক বিশ্বায়নের রাজনীতি প্রতিষ্ঠায় আই এম এফ সহ নানান বৈশ্বিক সংগঠন প্রতিষ্ঠায় স্তালিনকে সহযোগিতা করতে হয়েছে। তবু, সোভিয়েত সহ কথিত সমাজতান্ত্রিক কতিপয় রাষ্ট্রের পতন হয়েছে। চীন বাজার অর্থনীতি চালু করে যুক্তরাষ্ট্রকে

পেছনে ফেলে বিলিয়নিয়ার উৎপন্নে দুনিয়ায় প্রথম স্থান দখল করেছে আর ভিয়েতনাম দেশী-বিদেশী বিনিয়োগকে রাষ্ট্রীয়করণ না করার সাংবিধানিক নিশ্চয়তা দিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের চেয়ে ব্যক্তি মালিকানাকে নিরাপদ রাখতে স্বক্রিয়। কিন্তু, পুঁজির সংকট হতে রাষ্ট্রীয় পুঁজিতন্ত্রের রাজনীতি বা পুঁজিতন্ত্রী বিশ্বায়নের রাজনীতি সহ কোনো রাজনীতিই উত্তরণ ঘটাতে পারছে না বলে হালে পুঁজিপতি শ্রেণী দাসতন্ত্রের রাজনীতির আশ্রয়ে টিকে থাকার চেষ্টায় কেবল ফ্যাসিজম নয় বরং ফেনাটিক রাজনীতির চর্চা করছে। মন্দার কবল হতে রক্ষা করতে ব্যর্থ বটে আই এম এফ। ফলে, সমাজ শাসনে অক্ষম এক চরম প্রতিক্রিয়াশীল পুঁজিপতি শ্রেণী সহ অতি বয়োবৃদ্ধ পুঁজিবাদ আই এম এফের ইনটেনসিভ কেয়ার ইউনিটে অবস্থান নিয়ে মুমূর্ষ অবস্থায় টিকে আছে।

তাই, শত শত বছর যাবৎ শ্রমিকদের উৎপন্ন কিন্তু পুঁজিপতি শ্রেণীর মালিকানায় থাকা সমাজের বিপুল সম্পদ ও অর্থ থাকতেও তন্মধ্যে হতে সামান্য পরিমাণ কিছু অর্থাৎ প্রয়োজনীয় সম্পদ ব্যবহার ও অর্থ খরচ করে মজুর, এবং দৈনিক আয়-রোজগারী সহ অভাবী মানুষদেরকে প্রয়োজনীয় সমর্থন প্রদানের মাধ্যমে জীবিকার জন্য কর্মস্থলে যাওয়ার বাধ্যবাধকতা হতে অব্যহতি দিয়ে সমগ্র দুনিয়াটা ২মাসের জন্য একযোগে লক করে জরুরি সার্ভিসের মানুষেরা ছাড়া বাকী সকলকে ঘরে থাকতে বা ঘরে রাখার বিহীত করে যতোটা সম্ভব নিরাপদ থাকার দায়িত্ব নিতে অসম্মত হয়ে করোনার মতো একটি ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র জীবানুকে সব রাষ্ট্র/সরকার সহ জাতিসংঘ সংশ্লিষ্ট বৈশ্বিক সংস্থা গুলোর প্রধান নির্বাহীদের একত্রে কাজ করার মাধ্যমে বৈশ্বিক সমন্বিত প্রচেষ্টা সহ বৈজ্ঞানিকভাবেতো নয়ই এমনকি, গতানুগতিক পদ্ধতিতেও মোকাবেলা ও পরাজিত করতে অক্ষম চরম প্রতিক্রিয়াশীল পুঁজিপতি শ্রেণী অসংখ্য সংকট-সমস্যা ও দ্বন্দ্বে জর্জরিত সমাজের উপর এক বিশাল বোঝা ও প্রগতির পথে বাধা ও প্রতিবন্ধক হয়ে রয়েছে। এমনকি, অর্থলোভী এই পুঁজিপতিরা তাদের নিজেদের জীবনও যে করোনায় কেড়ে নিতে পারে তাও বিবেচনায় অক্ষম বলে ওদেরও কেউ কেউ ইতোমধ্যে মৃত্যুবরণ করেছে করোনায় । তবে, শাসক শ্রেণীর চরম অক্ষমতা, অবজ্ঞা ও অবহেলায় বেকারত্ব সহ চরম দুদর্শায় ও দুর্ভোগে পড়েছে শ্রমিক শ্রেণী। কোনো কোনো দেশে করোনাকে সামান্যতম নিয়ন্ত্রণে না এনেও গণ পরিবহন ও শ্রম-ঘন শিল্প সহ নানান কারখানায় কাজ করতে বাধ্য করে শ্রমিকদেরকে করোনার সস্তা শিকারে পরিণত করা হচ্ছে। অনাহারে ও বিনা চিকিৎসায় মারা যাচ্ছে শ্রমিকেরাই বেশী। অথচ, এদের উৎপন্ন পুঁজির প্রাচুর্য্যে ও বন্যায় ভেসে কতিপয় বিলিনিয়ার অদূর ভবিষ্যতে ট্রিলিনিয়ার হওয়ার স্বপ্নে বিভোর হয়ে আছে করোনা বিশ্বমারির চলতি তান্ডব ও দুর্যোগের কালেও।

প্রকৃতপক্ষে, বহু বছর আগে ব্যক্তিমালিকানার ক্ষয় শুরু হয়েও ট্রাস্ট, বহুজাতিক কোম্পানী, সমবায়, রাষ্ট্র ইত্যাদির মালিকানায় পুঁজিপতি শ্রেণী সহ এখনো টিকে আছে ব্যক্তিগত সম্পত্তি। তাই, ব্যক্তিগত সম্পত্তি হতে উদ্ভূত বা ব্যক্তিমালিকানা ভিত্তিক পুঁজিতান্ত্রিক উৎপাদন পদ্ধতির স্বার্থে সৃষ্ট নানান ধরণের রাজনীতি, মতাদর্শ, মূল্যবোধ, রীতি-নীতি, সংস্কার -সংস্কৃতি ইত্যাদি সমেত অসংখ্য রাজনৈতিক দল ও রাজনৈতিক বোধজাত নানান ধরণের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান , রাষ্ট্র এবং আই এম এফ সহ

নানান বৈশ্বিক সংগঠন বিদ্যমান বলেই শাসক শ্রেণী ও শাসকেরা ব্যক্তিমালিকানার গন্ডীতে আবদ্ধ ও বিভক্ত বলে করোনাভাইরাসকে একটি বৈশ্বিক মহামারি হিসাবে দুনিয়াময় তান্ডব চালানোর কেবল সুযোগই তৈরী করে দেয়নি বরং দুনিয়ার প্রায় সকল রাষ্ট্রের নির্বাহীরা সামগ্রীকভাবে বিশ্বের সকলের জীবনকে গুরুত্ব দিয়ে দেখা বা একটি একক মানবজাতির স্বার্থ বিবেচনা করা নয় বরং স্ব-স্ব রাষ্ট্রিক স্বার্থাধীনে পরস্পরের সাথে বিবাদ-বিরোধে লিপ্ত থাকায় করোনা বিশ্বমারীকে বৈশ্বিকভাবে তাদের সম্মিলিত বৈজ্ঞানিক প্রচেষ্টায় স্বল্পতম সময়ে ও স্বল্পতম খরচে যে নিয়ন্ত্রণ ও নির্মূল করা যায় তাও বিবেচনায় নিতে বৈশ্বিক রাজনৈতিক কর্তারা অযোগ্যতা ও অক্ষমতার পরিচয় দিয়ে যাচ্ছে। এমনকি, আধুনিক তথ্য-প্রযুক্তি সমতে আধুনিক বিজ্ঞানের সুযোগ-সুবিধা সহ সংশ্লিষ্ট বিষয়াদিতে যথেষ্ট পরিমাণ তথ্য-তত্ত্ব সমৃদ্ধ বিজ্ঞানী থাকা সত্ত্বেও প্রায় ৬ মাস হতে চলছে তবু অজানা করোনাকে এখন জানতে ও জানাতে পারেনি শাসক পুঁজিপতি শ্রেণী । কারণটা কি ক্ষতিকর ব্যক্তি মালিকানার সংকীর্ণ স্বার্থের শিকলবন্দীত্ব নয়? অতঃপর, পুঁজিপতি শ্রেণী কি বিপন্ন ব্যক্তিমালিকানা রক্ষা ও সংরক্ষায় মরিয়া হয়ে এটাই প্রমাণ করছে না যে ক্ষুদ্র একটা করোনাকে যেমন তারা আবিষ্কার ও দমন বা নিদেনপক্ষে ম্যানেজ করতে পারেনি বা তেমনটা করতে বিজ্ঞান সহ বিদ্যমান সামাজিক সুযোগ-সুবিধাকে ব্যবহার করেনি বিধায় চীনে দেখা দেওয়া তবে পুঁজিতন্ত্রী বিশ্ব ব্যবস্থার কারণেই স্বল্পতম সময়ে সমগ্র বিশ্বে ছড়িয়ে পড়া করোনায় যারা মারা গেছে তাদের জীবনহানির দায়ও তারা এড়াতে পারে না, ঠিক তেমন এই অতিলোভী ও নৃশংস এই শ্রেণীটি একটি অতি ক্ষুদ্র জীবানু হতেও মানবজাতিকে নিরাপদে রাখতে অক্ষম নয় কি? এই শ্রেণীটি কি সমাজকে এগিয়ে নেওয়ার ক্ষেত্রে কেবল বাধা ও প্রতিবন্ধক নাকি, পুঁজিতন্ত্রী উৎপাদন-পদ্ধতিও সচল ও স্বাভাবিক রাখতে চরম ব্যর্থতা ও দেউলিয়াত্ব নিশ্চিত করা সহ এই শ্রেণীটির অবস্থিতি কেবল অপ্রয়োজনীয়ই নয় বরং ভয়ানক ক্ষতিকর বলে নিশ্চিত করেনি? অথচ, এই ভয়ানক ক্ষতিকর পুঁজিপতি শ্রেণীর শোষণমূলক স্বার্থ রক্ষা ও সংরক্ষণে দমন-পীড়নে পটু রাষ্ট্রগুলো টিকে থাকতে পৃথিবীর মোট জিডিপির প্রায় ৩০% খরচ করছে মজুরদের সৃষ্ট উদ্বৃত্ত-মূল্য হতে। কিন্তু,সকলকে ঘরে থাকার নিদান দিয়েও করোনাকালে করোনায় সংক্রমিত হওয়ার সমূহ সম্ভাবনা ও আশংকার কথা জানা থাকা সত্ত্বেও কর্মস্থলে নিয়োজিত করা সহ মজুরদের প্রতি কি অমানবিক আচরণ করে যাচ্ছে ডিফ্যাংক্ট রাষ্ট্র তথা রাষ্ট্রের কর্তারা তাতো খোলা চোখেই দৃশ্যমান। কিন্তু, পুঁজিপতিদের হীন স্বার্থে করোনা দুর্যোগে অভুক্ত মজুরদের দায়-দায়িত্ব নেওয়ার মুরোদ দেখাতে না পারলেও মজুরদের বিরুদ্ধে মামলা, হামলা ও গুলি করতেও কুণ্ঠাবোধ করছে না ডিফ্যাংক্ট রাষ্ট্রের কর্তারা।

অতঃপর, রাষ্ট্র সহ পুঁজিতন্ত্রের স্বপক্ষে ক্রিয়াশীল সকল সংগঠনের কবল হতে মুক্ত হওয়া মজুর শ্রেণীর স্বার্থেতো বটেই উপরন্ত, করোনা সমেত নানান সংক্রমণ ব্যাধি ও প্রাকৃতিক দুর্যোগ এবং পুঁজির স্বার্থাধীনে পুঁজির দাস -পুঁজিপতি শ্রেণীর সৃষ্ট সীমাহীন সংকট-সমস্যা, দ্বন্দ্ব-সংঘাতে জর্জরিত ও বিধ্বস্ত পুঁজিতন্ত্রী সমাজের বাসিন্ধা তবে পুঁজিতন্ত্রের সৃষ্ট দুর্ভোগ, দুর্দশা, অনিশ্চয়তা,

উৎকণ্ঠা, উদ্বেগ ও অশান্তিতে দিনাতিপাত করছেন তাদের স্বার্থেও দরকার বটে। কিন্তু, স্বাভাবিক জীবন-যাপনে অযোগ্য এহেন ভংগুর পুঁজিতন্ত্রী সমাজের শোষক-শাসক শ্রেণী তথা স্বার্থান্ধ পুঁজিপতি শ্রেণী পুঁজির স্বার্থ বৈ কিছুই ভাবতে রাজী নয়। অতঃপর, এই অযোগ্য, অক্ষম অথচ চরম হিংস্র ও উন্মত্ত ও ভয়ানক লোভী ফলে বিবেচনাবোধহীন শোষক-শাসক পুঁজিপতি শ্রেণী নিজের সংকীর্ণ স্বার্থে শ্রমিক শ্রেণীর সাথে যে বিরোধ-বৈরীতা চালিয়ে যাচ্ছে তার ইতি হওয়া আবশ্যক। এবং তা আবশ্যক বটে সমগ্র মানব জাতির স্বার্থেও। সেজন্য, শোষক-শাসক পুঁজিপতি শ্রেণীর সাথে শোষিত- শাসিত মজুর শ্রেণীর চলমান বিরোধকে একটি যৌক্তিক পরিণতির মাধ্যমে অবসান ঘটিয়ে দুনিয়ার সকলের নিরাপদ ও সুস্থ স্বাস্থ্য সহ সমৃদ্ধি,সুখ, আনন্দ ও নিরবচ্ছিন্ন শান্তিতে বসবাসের বিহীতকরণে দুনিয়ার মজুরদের একতা ভিন্ন আর কোনো বিকল্প নাই।

কিন্তু, সেজন্য দুনিয়ার শ্রমিকদেরকে সংগঠিত করার জন্য শ্রমিক শ্রেণীর কোনো পার্টিতো নাই-ই বরং ১৮৯৬ সালের পর হতে কার্যত দুনিয়ায় কমিউনিস্ট আন্দোলনও নাই। বলা চলে কুচক্রী পুঁজিপতিরা এখনোতক সফল বটে মজুরদেরকে নিজ শ্রেণীর মুক্তির কমিউনিস্ট আন্দোলন হতে দূরে রাখতে। কিন্তু, কমিউনিস্ট আন্দোলন ছিল, এবং কমিউনিস্ট আন্দোলন ও বিপ্লবের জন্য কমিউনিজমের বিজ্ঞান সমেত কমিউনিস্ট সাহিত্যও মার্কসরা রচনা করেছিলেন। অতঃপর, মজুরদের সামাজিক শ্রমে উৎপন্ন পুঁজির অন্যায়, অন্যায্য ও অযৌক্তিক পুঁজিতন্ত্রী ব্যক্তিমালিকানা বিলোপ করে উৎপাদন, পরিবহন ও যোগাযোগের উপায়াদির খুবই ন্যায় সংগত ও ন্যায্য সামাজিক মালিকানার সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় একটি কমিউনিস্ট বিপ্লব সংঘটনে দুনিয়ার শ্রমিকদেরকে একতাবদ্ধকরণে এক ঐতিহাসিক প্রয়োজন হিসাবে একটি কমিউনিস্ট পার্টি গড়ে তুলতে সহায়তা করতে অবলুপ্ত কমিউনিস্ট আন্দোলনকে পুনরুদ্ধার ও পুনর্গঠন করা আবশ্যক।

ইনফরমেশন সেন্টার ফর ওয়ার্কার্স ফ্রিডম তার প্রতিষ্ঠাকাল হতে কমিউনিস্ট আন্দোলন পুনরুদ্ধার ও পুনর্গঠনে সহায়তা করতে আবশ্যকীয় অনুসন্ধান, গবেষণা ও প্রয়োজনীয় তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করছে; সেসব সংগৃহীত বিষয়াদি কমিউনিজমের বিজ্ঞানের ভিত্তিতে আলোচনা-পর্যালোচনা, ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করে পুনঃপুন পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে উপসংহারে উপনীত হয়ে মতামত ও অভিমত লিখিতভাবে প্রকাশ, প্রচার ও সংরক্ষণ করছে। তদমর্মে চিন্তার বিনিময় করা সহ সমচিন্তকদের একত্রে কাজ করতে সেন্টারের মতামত-অভিমত ও পর্যবেক্ষণ ইত্যাদি শেয়ার ও আলোচনা করছে। লক্ষ্য- শ্রমিক শ্রেণীর একটি পার্টি গড়ে তোলা।

শাহ্ আলম

সদস্য,

ইনফরমেশন সেন্টার ফর ওয়ার্কার্স ফ্রিডম

www.icwfreedom.org

e-mail: icwfreedom@gmail.com

Mobile: 88+0171-5345-006

Dhak-15th June, 2020.